দৈনিক ইনকিলাব
দৈনিক ইনকিলাব
তারিখ 13 JUL 1986 পৃষ্ঠা 6-5
13 JUL 1986
047

বাংলাদেশে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা

।। সৈয়দ আব্দুল কাদের ।।

অনুন্নতদের মাঝেও অনুন্নত

বাংলাদেশ পৃথিবীর অনুন্নত দেশগুলোর মাঝেও প্রায় সর্বনিম্নে এসে পৌঁছেছে। অথচ তা হবার না। যে অঞ্চল নিয়ে বাংলাদেশ গঠিত তার মানব সম্পদ ও প্রাকৃতিক সম্পদ প্রচুর সম্ভাবনাময় ছিল বলেই স্বীকৃত হবার কথা। এ অঞ্চল থেকে ১৯৪৭ সালে বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান হয়, পাকিস্তানের আওতায় এ অঞ্চল স্বাধীন হয়। কিন্তু শিকার হয় নব্য ঔপনিবেশিক শোষণের। ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধলব্ধ স্বাধীনতার পরও একটি স্বাধীন জাতির—তা ধনতান্ত্রিক বা সমাজতান্ত্রিক যাই হোক না কেন—প্রাথমিক কর্তব্য নিরক্ষরতা দূরীকরণে ব্যর্থ হয়েছে, প্রাথমিক শিক্ষা এমন কি পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত প্রসার লাভ করাতেও অপারগ হয়েছে। অথচ '৪৭ পরবর্তীকালে ঔপনিবেশিক শাসনমুক্ত হবার পর বা নতুন বৈপ্লবিক রাষ্ট্র কাঠামো প্রতিষ্ঠার পর (যেমন গণচীন) বহু দেশ নিজের দেশকে নিরক্ষরতামুক্ত করেছে, এমন কি অষ্টম শ্রেণী বা পনেরো বছর বয়স পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নে প্রভূত অগ্রগতি সাধন করেছে—যার ফলশ্রুতি দেখা দিয়েছে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে, জাতীয় মর্যাদা ও স্বাধীনতা সুদৃঢ়করণে।

শিক্ষায় বৈষম্য বড় বৈষম্য

নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও ন্যূনতম প্রাথমিক ও নিম্নমাধ্যমিক শিক্ষা বিস্তার নেহায়েতই জাতীয় মর্যাদা সমুন্নত করার লক্ষ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বাংলাদেশের অনুন্নয়ন, এমনকি পশ্চাৎমুখীতা (যার নিদর্শন দ্রুত ভূমিহীনতা ও অধিকাংশ মধ্যবিত্তের দারিদ্র্য-সীমার নীচে ধাবিত হওয়ার মাঝে প্রতীয়মান হচ্ছে) গতানুগতিক অর্থনৈতিক বিশ্লেষণে মাথাপিছু অতি নিম্ন আয়, ফলে অপ্রতুল সঞ্চয় ও বিনিয়োগের কারণ হয়ে থাকে বলে ধরে নেয়া হয়। সাম্প্রতিকালে প্রচুর বৈদেশিক পুঁজি সাহায্যপুষ্ট হয়েও বাংলাদেশ ভারত পাকিস্তানের মতো অনুন্নত দেশগুলোর বৃহত্তম জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য রোধের অক্ষমতা ও অক্ষুণ্ণ ক্রবর্ধমান অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির নিশ্চয়তা প্রদানে অসামর্থ্যের জন্য সমাজে বিত্ত ও আয়ের বন্টন-বৈষম্যকে প্রধানতঃ দায়ী করা হচ্ছে। সে জন্য অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি প্রচেষ্টার আগে সামাজিক ন্যায় বিচার ... পরিসম্পদ ও বিত্তের সমতাভিত্তিক বন্টন নিশ্চিতকরণের মাঝ দিয়ে করার কথা বলা হচ্ছে। আর এক অর্থে এটা ক্ষমতা বন্টনের প্রশ্ন, সংখ্যাগুরু দারিদ্র্যের মাঝে ক্ষমতা প্রত্যর্পণের প্রশ্ন। এ ক্ষমতা আসছে শিক্ষা, তথ্য (ইনফরমেশন) ও বিত্তের মালিকানা বা নিয়ন্ত্রণ থেকে। আমাদের সমাজে জন্ম, গোষ্ঠী, উপজীবিকার ব্যবধানে সামাজিক বৈষম্য বিদ্যমান। অনেক ক্ষেত্রে অর্থ থাকলেও, সামাজিক নিম্নবর্ণতার কারণে ব্যক্তি বা পরিবার জাতির উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সক্রিয় অংশগ্রহণ থেকে বঞ্চিত। সেক্ষেত্রে আমাদের গ্রাম সমাজে দেখা যায় শিক্ষাকে ব্যক্তি বা পরিবারকে সেই সামাজিক মর্যাদা দিতে সক্ষম। সেজন্য বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষার প্রয়োজন নেই। বরং নিম্নপর্যায়ের শিক্ষার ব্যাপকতা না ঘটিয়ে উচ্চশিক্ষার বিস্তার—যা আমাদের দেশে ঘটছে, তা বৈষম্য ও অনুন্নয়নকে প্রকট করছে। ঔপনিবেশিক আমলের কেরানী ও আমলা সৃষ্টির প্রয়াসে সেকেলে ধরনের একপেশে বিএ, এমএ পাসের এক দিকে যেমন প্রয়োজনীয়তা নেই, তেমনি অপরদিকে এতে শ্রমবিমুখ বেকারের সংখ্যাই বাড়ছে। তেমনি মাঝারি ধরনের কারিগর সৃষ্টি না করে ডিগ্রী ইঞ্জিনিয়ারের আধিক্য উৎপাদন ক্ষেত্রে অসুবিধা বাড়াচ্ছে। যেখানে একজন ইঞ্জিনিয়ারের জন্য ৫ জন কারিগর ও ১৫ জন দক্ষ কর্মীর সেখানে রয়েছে মাত্র ৩ জন কারিগর ও ১ জন দক্ষকর্মী।

অবশ্য বর্তমানে চালু দ্বিতীয় পাঁচসালা (১৯৮০-৮৫) পরিকল্পনায় প্রতমোক্ত অনুপাতের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের চেষ্টা চলছে। এক হিসেবে দেখা যায় যে, বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে একজন ছাত্রের পেছনে যেখানে খরচ হয় প্রায় ২৩৯৩ টাকা, সেখানে প্রাথমিক স্কুলে হয় প্রায় ৩২ টাকা অর্থাৎ একটি ডিগ্রীধারী ব্যক্তি সৃষ্টি করতে প্রায় ৭৫টি সন্তানকে প্রাথমিক শিক্ষালাভ করা থেকে বঞ্চিত হতে হয়। এ দেশে প্রচলিত বি এ ডিগ্রীর জন্য পড়াশোনায় অপর এক সমস্যা হলো প্রতি বছর পরীক্ষায় অকৃতকার্যতার সংখ্যাধিক্য (শতকরা প্রায় ৮৮ ভাগ)। ফলে বাড়ছে অর্থ ও সময়ের অপব্যয় এবং বেকারত্ব। অর্থনীতিবিদরা হিসাব করে দেখিয়েছেন যে, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাদানে সমাজের লাভ বেশী আর উচ্চ শিক্ষাদানে উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তি বিশেষের লাভ বেশী।

নিরক্ষরতা দূরীকরণে ও সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা জাতীয় চেতনা ও উন্নয়নের পূর্বশর্ত

গ্রাম শহরাঞ্চলে অধিকসংখ্যক জনগোষ্ঠী অর্থাৎ সমগ্র জাতির প্রায় শতকরা ৭৫ ভাগ নিরক্ষর, সামাজিক ও চেতনার স্তরে নিম্নতম পর্যায়ে রয়েছে। উল্লেখযোগ্য যে, গ্রামাঞ্চলে প্রায় শতকরা ৩০টি গোটা পরিবার নিরক্ষর, অর্থাৎ পরিবারের একজনও স্কুলে যাননি। আরও প্রায় শতকরা পনেরো ভাগ যারা নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীভুক্ত ও কিছুটা অভিজাত্যের দাবী করে থাকেন, তাদেরও শিক্ষাম পর্যায়ের—তাদের শিক্ষিত বলা যায় না। বরং কুসংস্কারপূর্ণ পুরাতন ধ্যান-ধরণাকে অটুট রেখে এরা উন্নয়নের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। সারা দেশব্যাপী পরিবার পরিকল্পনার উপর একটি গবেষণা থেকে দেখা যায় যারা প্রাইমারীর উপরে লেখাপড়া করেছেন এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে উচ্চমধ্যবিত্ত আনুপাতিক হারে তাদেরই অধিকসংখ্যক পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করে থাকেন। অপরদিকে ভূমিহীন দরিদ্র ও নিরক্ষর জনসাধারণ আনুপাতিকভাবে কম করে হলেও পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। অনুমান করা যায় প্রথমোক্ত শিক্ষিত উচ্চমধ্যবিত্তগণ সুচিন্তায় জীবনের উন্নতমান রক্ষার্থে তা করেন এবং শেষোক্তগণের অনেকেই কতকটা প্রয়োজনে আবার কতকটা শাড়ী-লুঙ্গী-অর্থের বিনিময়ে করেন। কিন্তু নিম্নমধ্যবিত্তের মাঝে পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণ দরিদ্রের থেকেও কম দেখা যায়। তাদের রক্ষণশীলতা পশ্চাৎপদতার একটা নিদর্শন দেখা যায় পুত্র-সন্তানদের স্কুলে পাঠালেও কন্যা-সন্তানদের বেলায় তা করতে অনেকেরই দ্বিধা। পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণে ভূমিহীন দরিদ্র হলেও এতটা বাধা নেই, যতটা বাধা দেখা যায় সামাজিকভাবে নিম্নপর্যায়ভুক্ত হলে বা মনে করলে। তার প্রধান কারণ হলো, পরিবার পরিকল্পনা বা সন্তানদের স্কুলে পাঠানো (যা তথাকথিত ছোট লোকদের জন্য সামাজিকভাবে নিষিদ্ধ বা নিরোৎসাহিত করা হতো) সমাজের প্রচলিত ধ্যান-ধারণা ও রীতিনীতিকে প্রায় ভংগ করার সামিল। সামাজিক অবস্থান যাদের উঁচুতে তারাই তা করতে সাহস পান ও সক্ষম। এই সাহস ও সক্ষমতা অর্জন করতে হলে নিম্নস্তরে অবস্থান বড়দের সামাজিকভাবে মুক্তি অর্জন করতে হবে। বাংলাদেশের জন্য তার প্রধান, এমনকি একমাত্র শর্ত অন্ততঃপক্ষে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা সার্বজনীন ও বাধ্যতামূলক করা। সে শিক্ষা শিক্ষার্থীদের কেবল অক্ষর ও সংখ্যাজ্ঞানই দিবেনা স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসাবে ও বর্তমান দুনিয়ার সংগে তাল মিলিয়ে চলার জন্য উপযুক্ত মনমানসিকতা গড়তে সহায়ক হবে। মসজিদ মক্তব-মাদ্রাসাতে পড়ালেও এটা মনে রাখতে হবে।

সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার সফল বাস্তবায়নের সব কথার মুদ্দা কথা—

পঞ্চাশের দশক থেকেই প্রতি পাঁচসালা পরিকল্পনাতে একাধিক শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু তা হওয়া তো দূরের কথা, ১৯৮০ সাল পর্যন্তও বাংলাদেশে যে প্রায় চুয়াল্লিশ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় ও একলক্ষ ছিয়াশী হাজার প্রাথমিক শিক্ষক বিদ্যমান ছিল, কিছুটা অপ্রতুল হলেও তারও পূর্ণ সদ্ব্যবহার হয়নি। নিরক্ষরের প্রকৃত সংখ্যা বেড়েই চলেছে। ১৯৮০ থেকে বিশ্ব-ব্যাংকের সক্রিয় আর্থিক সহায়তায় বিভিন্ন দিকে যেমন অধিকতর শিক্ষক নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ, প্রশাসনিক সুব্যবস্থা এবং পরিদর্শন, বিদ্যালয় গৃহ সম্প্রসারণ ও পাকাকরণ, পুস্তক পোশাক বিতরণ, সুষম পাঠক্রম ইত্যাদি বিষয়ে কমবেশী পদক্ষেপ গ্রহণ করলেও এ পর্যন্ত (চার বছর অতিক্রান্ত) প্রকৃতপক্ষে বিদ্যালয়-বয়সী (পাঁচ থেকে ১০ বছর অথবা ৬ থেকে ১১ বছর বয়স পর্যন্ত) ছেলে-মেয়েদের শতকরা ষাট জনের বেশী স্কুলে নাম লিখিয়েছে ও যাচ্ছে বলে হিসেবে পাওয়া যায় না। তদুপরি যারা নাম লিখিয়েছে তাদেরও প্রথম শ্রেণীভুক্ত সরকারী স্বীকৃতিহীন বেবী ক্লাশে আটকে পড়া, মাঝপথে বিদ্যালয় ত্যাগ বা পুনঃ পুনঃ ফেল করার ফলে একই শ্রেণীতে অবস্থানজনিত কারণে ১৯৮৪ সনের একটি হিসেবের প্রতি একশত ছাত্র-ছাত্রীর প্রায় ৪০ জন প্রথম শ্রেণী থেকে অনুপাত কমতে কমতে পঞ্চম শ্রেণীতে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে প্রায় ৮ জনে। জাতীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন ফাউণ্ডেশন কর্তৃক ১৯৭৮ সালে দেশব্যাপী তথ্য অনুসন্ধান অনুযায়ী স্কুল প্রতি মাত্র ১১ জন ছাত্র-ছাত্রী ৫ম শ্রেণী উর্ত্তীর্ণ হয়ে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপন করতে পেরেছে, শিক্ষক প্রতি এই হার হল মাত্র ২ থেকে ৩ জন। আর একটি বিষয় হল, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছেলেও মেয়ের উপস্থিতির হারে বৈষম্য, এই অনুপাত প্রায় ৬০ঃ৪০। শিক্ষক-শিক্ষিকার হারের বৈষম্য অনেক বেশী, প্রায় ৯০ঃ১০। অন্ততঃ প্রাইমারী স্তরে সকল স্কুলে বয়সী মেয়ের উপস্থিতি ও অধিকাংশ শিক্ষক নারী হওয়ায় বিভিন্ন দিক বিবেচনা করা অতীব বাঞ্ছনীয়। এ' বছরেই একটি গবেষণা কর্মীর দল

২-এর পৃষ্ঠা দেখুন